৭ মার্চের ভাষণ

ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র 'সিরাজুল আলম খান'। একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ের সশস্ত্র যুদ্ধের প্রধান সংগঠক এবং স্বাধীনতার প্রধান রুপকার। তিনিই বাংলাদেশের মূল স্থপতি!

আলোচনা করবো, **'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম',** স্লোগানের প্রসঙ্গ নিয়ে।

স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, ৭ মার্চের কী এক অলৌকিক মুহূর্তে ভাষণটি অমন অসামান্য প্রমিত বাক্যের মিশেলে পরিশ্রুত বাচনভঙ্গি এবং আঙ্গিকগত স্বতন্ত্র বাঙময়তায় প্রকাশিত হয়েছিলো, এবং সে ভাষণের সাবলীল ভাষাভঙ্গি ও মানবিক কাঠামো ছিলো অতিমাত্রায় হৃদয়স্পর্শী। যা সে মুহূর্তে উপস্থিত সকলের কাছে মনে হয়েছিলো, এ যেন কোনো ঐশী বাণী কিংবা স্বর্গীয় মমতার স্পর্শে উচ্চকিত ভাষণ। যে ভাষণ মানুষকে তাঁর মর্মমূল থেকে গভীরভাবে আবেগকম্পিত, উদ্দীপিত এবং জাগ্রত করে তুলেছিলো। সে ভাষণের পরতে পরতে অনুষঙ্গ হয়ে থাকা বিদ্রোহের বাণী মানুষকে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহী করে তোলে। এমনকি প্রয়োজনে রণশীল সশস্ত্র যোদ্ধার ভূমিকায়ও অবতীর্ণ করে। এজন্যই বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালির স্বাধীনতার বীজমন্ত্র', সশস্ত্র যুদ্ধের অনিঃশেষণীয় প্রেরণা এবং এগারোশ' বছরের পরাধীনতার শেকল ভেঙে বাঙালির কাঙ্খিত 'স্বাধীনতার স্বপ্ন' বাস্তবায়নের এক শক্তিশালী অস্ত্র!

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হওয়া একটি প্রতিবেদনের প্র তি সম্মতি পোষণ করে বলছি , বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চ দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণ স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র হয়ে পড়েছিলো তা সম্পূর্ণরুপে সত্যি এটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলিলই নয় , এ ভাষণ জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় বিধানের একটি সম্ভাবনা তৈরি করেছিলো । অন্যদিকে এ ভাষণ তথাকথিত পরিশীলিত বাচন ভঙ্গিতে না গিয়ে সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক ভাষার আদল থাকায় গোটা দেশের মানুষকে আপ্লুত এবং মুক্তির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলো । আর এ মন্তব্য করেছেন দেশের সাংস্কৃতিক–নাট্য এবং ভাষা বিশেজ্ঞরা!

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী বলেন, "ভাষণে বঙ্গবন্ধু যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন সেগুলো ছিলো চূড়ান্ত লড়াইয়ের নির্দেশ, সবকিছুকে ছাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন, **'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'** এরপরেই অকুতোভয় বাঙালি এবং সর্বস্তরের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মুক্তির চূড়ান্ত লড়াইয়ে। ঐক্যবদ্ধ মানুষের শক্তি যে কত প্রচণ্ড হতে পারে তা দখলদার বাহিনী তো বটে সারাবিশ্বের মানুষও দেখেছিলেন অবাক বিস্ময়ে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সকলের মধ্যে সচেতনতা এবং প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলো। আর সে কারণে মানুষ নির্দ্বিধায় প্রাণ বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন।"

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান বলেন, "বঙ্গবন্ধু "যে ভাষণ দিয়েছিলেন ইতিহাসে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ এড্রেস বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চার্চিলের ভাষণসহ অন্য কোন ভাষণের সঙ্গে এ ভাষণের তুলনা চলে না। এদেশের মাটি মানুষ নিস্বর্গ প্রকৃতি এবং জীবনধারার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এ ভাষণে মনে হয় যেন বঙ্গবন্ধু জীবনব্যাপী সাধনায় ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। এমনও মনে হয়, বাঙালির হাজার বছরের দুঃখ বেদনা, বঞ্চনা এবং ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে থাকার ইতিহাস। কৃষক, কৈবর্ত, উপজাতিদের বিদ্রোহ প্রভৃতির বারুদ ঠাসা উপাদানে তার সচেতন এবং অবচেতন মনে ভাষণটি তৈরি হয়ে প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়েছিলো।"

একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু ৭ মার্চের ভাষণকে আধুনিক ইতিহাসের অনন্য রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা এবং আন্দোলনের দলিল হিসেবে অভিহিত করে বলেন, "এতে ভাষাগত যে উৎকর্ষ আছে তা রীতিমত বিষ্ময়কর। তিনি বলেন, কলকাতা কেন্দ্রিক ভাষার বাক্য প্রকরণ রীতির বিপরীতে পদ্মাপাড়ের ভাষা ও বাক্য প্রকরণ রীতির উন্মেষ ঘটেছিলো এ ভাষণের মধ্যে। এতে করে যে ঘটনাটি ঘটেছে তা হচ্ছে, বাংলাভাষা একটি সুনির্দিষ্ট দিকে বাঁক নেয়, যা পোশাকী ভাষার বিপরীতে

ভাটি বাংলার মৃত্তিকা সংলগ্ন ভাষা। এ কারণে শুধু রাজনৈতিক দলিল নয়, একটি সাংস্কৃতিক পরিচয় বিধানের সম্ভাবনা তৈরি করেছিলো এ ভাষণ।"

'এদেশের মাটি মানুষ নিস্বর্গ প্রকৃতি এবং জীবনধারার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এ ভাষণে মনে হয় যেন বঙ্গবন্ধু জীবনব্যাপী সাধনায় ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন'-এ কথাটির সঙ্গে একমত নই। কারণ কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, শতাব্দী নয় এগারোশ' বছরের পরাধীনতার শেকল ভেঙে বাঙালি জনগোষ্ঠির মনের গভীরে স্বাধীনতার অর্জনের জন্য, যে আকুতিকে ছন্দময় অলঙ্করণের মাধ্যমে অক্ষর ও ভাষা দিয়ে নয়; মূলত জাতির সামগ্রিক আকাংখাকে তুলে ধরে গণ-মানুষের ছায়ালোকে প্রতিভাত হয় তা-ই হলো, '৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ!'

৭ মার্চের ভাষণের পর্যায়কালে স্বাধীনতার বিষয়কে তুলে ধরতে বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর যে ক'জন মানুষ এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তা জানিয়ে রাখা আবশ্যক। এ পর্যায়ের জনগণের আকাংখাকে ছায়ারুপ দিতে 'নিউক্লিয়াস' নামের গোপন সংগঠন এবং তার তিন সদস্য সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদকে যথাযোগ্য স্থান দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইতিহাস কখনো পেছনের দিকে ধাবিত হয় না , তবে কখনো-কখনো আমরা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই! আবার এ পুনরাবৃত্তিও কখনো এক-ই রকমের হয় না! উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মার্কসবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস তার বন্ধুপ্রতিম মার্ক্সবাদের-ই প্রবক্তা কার্ল মার্ক্স-কে লিখা একটি চিঠিতে লিখেছিলেন , ইতিহাসের এ পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে। আর তার জবাবে মার্ক্স লিখেছিলেন, 'হ্যাঁ, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কখনও দেখা যায়, তবে প্রথমবার ট্র্যাজেডি হলে পরবর্তীবার এটি হয় প্রহসন!'

বঙ্গবন্ধুর উচ্চারিত ৭ মার্চের এ ভাষণ যদি স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র হয়ে থাকে তবে আসুন জেনে নেই, ঐতিহাসিক এ ভাষণের অজানা ইতিহাস এবং এর নেপথ্য কাহিনী...

১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে পুলিশ, বিডিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে 'ডিফেকশান'র পরিকল্পনা করে 'নিউক্লিয়াস'। ৭ মার্চের পর থেকে স্বাধীনতার যাবতীয় প্রচার র্কমকাণ্ড বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামেই পরিচালিত হতো। 'নিউক্লিয়াস'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩ মার্চে ঘোষিত স্বাধীনতার ইশতেহারে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা আছে। 'নিউক্লিয়াস' (সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদ), 'বিএলএফ' হাই কমান্ড (সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মনি এবং তোফায়েল আহমেদ) ও আওয়ামীলীগ হাই কমান্ড (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী) এর সঙ্গে আলোচনা করেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর মুখে উচ্চারিত **"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"** বাক্য সংযোজনের কৃতিত্ব 'নিউক্লিয়াস'র। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 'নিউক্লিয়াস' দেশের সর্বত্র সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে তোলে। আন্দোলনের প্রচণ্ডতার কারণে অবাঙালি প্রশাসন ভেঙে পড়ে। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অবাঙালি প্রশাসনের জায়গায় আন্দলোনমুখী প্রশাসন গড়ে তোলা, চুরি-ডাকাতি-সন্ত্রাস-রাহাজানি ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য ছাত্র ব্রিগেড, যুব ব্রিগেড, নারী ব্রিগেড, শ্রমিক ব্রিগেড, কৃষক ব্রিগেড এবং 'জয় বাংলা' বাহিনী গঠন করা হয়। ছাত্র-যুবকদের সংগ্রহ করে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য সংঘটিত করা হয়। অবাঙালি প্রশাসন ভেঙে পড়ে আর গড়ে উঠে এসব সংগঠন, যারা পরবর্তীতে ভারতে গিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য প্রাথমিকভাবে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলো।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" কি করে যুক্ত হলো?

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পেছনেও রয়েছে এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৬২ সালের প্রথমার্ধে তৎকালীন ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান , আবদুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদ (তিন জনই ছাত্রলীগ নেতা) এর সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট গোপন সংগঠন 'নিউক্লিয়াস' বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠিত হয়। ঢাকার পল্টনের আউটার স্টেডিয়ামের দক্ষিণ প্রান্তে ভলিবল

খেলার মাঠে দর্শকদের জন্য তৈরি কাঠের গ্যালারীতে রাতের পর রাত এমন কী গভীর রাত পর্যন্ত বহুবার বৈঠকে বসে বাঙালিদের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই মূলত 'নিউক্লিয়াস' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত নিউক্লিয়াস '-এর সাংগঠনিক তত্ত্বাবধানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গোপনে প্রায় ৭০০০ (সাত হাজার) সদস্য সংগৃহীত হয়। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে সিরাজুল আলম খান এবং আবদুর রাজ্জাক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে নেতৃবৃন্দ 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর গঠন এবং সাংগঠনিক বিস্তৃতি সম্পর্কে অবহিত করেন। 'নিউক্লিয়াস' সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু আগেভাগেই অবগত ছিলেন না। এ বৈঠকেই সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক বঙ্গবন্ধুকে আশ্বস্ত করেন যে , স্বাধীনতার বিষয়ে 'নিউক্লিয়াস' এবং 'বিএলএফ'-এর কর্মী বাহিনী সাংগঠনিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ। দেশের সর্বত্র এমনকি প্রতিটি থানা পর্যায়ে সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত সদস্যরা স্বাধীনতার সপক্ষে জনসমর্থন ও সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ যে কোনো পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম।

বৈঠকে 'নিউক্লিয়াস'/'বিএলএফ'-এর' নেতৃবৃন্দ বলেন, এখন প্রয়োজন বিদেশের সঙ্গে বিশেষ করে প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে স্বাধীনতার বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন করা। ভবিষ্যতে বিদেশী সাহায্য সহযোগিতার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা করা।

এ বৈঠকের কয়েক দিন পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব লন্ডনে যান এবং সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূতের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। সে অনুযায়ী 'নিউক্লিয়াস' নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের দু'টি সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারত থেকে অস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। এরপরই মার্চের ২৫ তারিখ পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের মুখে ভারত থেকে অস্ত্র আনার বিষয়টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয় ; যা পরবর্তীতে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের রূপ ধারণ করে।

১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে বঙ্গবন্ধু 'বিএলএফ'-এর চার নেতা সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মণি, এবং তোফায়েল আহমেদকে ডেকে শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতার-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ওই দিন প্রথম সাক্ষাতেই শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতার 'বিএলএফ নেতৃবৃন্দকে ২১, ড. রাজেন্দ্র রোড, নর্দান পার্ক, ভবানীপুর কলকাতা-৭০০০২১ ঠিকানাটি মনে রাখতে বলেন। 'নিউক্লিয়াস' নেতারা ওই ঠিকানাটি ৩/৪ বার মুখে উচ্চারণ করে এবং মুখস্ত করেন। বঙ্গবন্ধু নিজেও কয়েকবার ঠিকানাটি আওড়ান।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮/১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিএলএফ-এর চারনেতাসহ সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মনি ও তোফায়েল আহমেদ এবং আওয়ামীলীগ হাই কমান্ডের নেতা তাজউদ্দিন আহমেদকে নিয়ে বাংলাদেশে স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনায় বসেন। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দিনকে স্বাধীনতার প্রশ্নে বিএলএফ-এর চার নেতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয়ে অবগত করেন। বৈঠকে তিনি পরামর্শ দেন ভবিষ্যতে কখনো যদি 'তার' (বঙ্গবন্ধু) অনুপস্থিতি ঘটে তাহলে বিএলএফ-এর চার নেতা তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেই স্বাধীনতার সমস্ত কৌশল নির্ধারণ করবেন। বৈঠকে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টিও পুনরায় তিনি তাজউদ্দিন আহমেদ ও চার নেতাকে স্মরণ করিয়ে দেন এবং ২১, ড. রাজেন্দ্র রোড, নর্দান পার্ক, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২১ ঠিকানাটি তিনি তাদের মনে রাখতে বলেন।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে ৩ মার্চ তারিখে গণপরিষদের অধিবেশন বাতিল করলে ছাত্র-জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দিলকুশার হোটেল পূর্বাণীতে পার্লামেন্টারি দলের বৈঠক করছিলেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে তিনি ('নিউক্লিয়াস'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুকুম দেন। শুরু হয় স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলন। 'নিউক্লিয়াস'-এর পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ মার্চ ডাকসুর ভিপি আ স ম আবদুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ৩ মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে স্বাধীনতাকামী ছাত্র-জনতার বিশাল সমাবেশে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজাহান সিরাজ 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার পক্ষে চার ছাত্র নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, সাজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব এবং আবদুল কুদ্দুস মাখন শপথ বাক্য পাঠ শেষে 'জয়বাংলা

বাহিনীর উপ-প্রধান (ডেপুটি চীফ) কামরুল আলম খান খসরু আনুষ্ঠানিকভাবে 'গান ফায়ার' করে সশস্ত্র যুদ্ধের ঘোষণা জানান।

মার্চের ৩ তারিখ রাত ১১/১২টার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিএলএফ-এর চার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে ৭ মার্চের ভাষণের বিষয় নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামী লীগের একটি 'হাইকমান্ড' গঠনের প্রস্তাব দেন বিএলএফ 'র চার ছাত্র নেতা। বঙ্গবন্ধু বললেন , তিনি নিজেও এরকমই ভেবেছেন।

মার্চের ৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু 'বিএলএফ'র চার নেতা সিরাজুল আলম খান , শেখ ফজলুল হক মণি , আবদুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদকে ডেকে আওয়ামী লীগের 'হাইকমান্ড' গঠন সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জানান, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই আওয়ামী লীগের 'হাইকমান্ড' গঠন করা হয়েছে। 'হাইকমান্ডে' অন্য যারা সদস্য হয়েছেন তারা হলেন , সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, খন্দকার মোস্তাক আহমেদ এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। আওয়ামী লীগের 'হাইকমান্ড' গঠনের পর থেকে বঙ্গবন্ধু প্রতি রাতেই আন্দোলনের সকল বিষয় নিয়ে আওয়ামী লীগের 'হাইকমান্ড'-এর চার নেতা এবং বিএলএফ'র চার নেতার সঙ্গে আলোচনায় বসতেন।

৫ মার্চ তারিখে ৭ মার্চের ভাষণের বিষয় নিয়ে প্রথমে বিএলএফ'র 'হাইকমান্ড' সিরাজুল আলম খানসহ চার নেতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা হয়। ওই দিনই তিনি আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের সঙ্গে ৭ মার্চের ভাষণের বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বিএলএফ'র প্রস্তাব সমূহ তাদেরকে অবহিত করেন।

বঙ্গবন্ধু ৫ মার্চ পৃথকভাবে পুনরায় 'বিএলএফ'-এর হাইকমান্ডের সঙ্গে ভাষণের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনায় বসেন। সেদিন অধিক রাতে ৭ মার্চের ভাষণের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। তা হলো, ভাষণটি খুবই আবেগময়ী হতে হবে এবং মূল ভাষণটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যা পরের দিন ৬ মার্চ আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের কাছে বঙ্গবন্ধু তুলে ধরেন। আওয়ামী লীগ 'হাইকমান্ড'-এর নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবটি নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেন এবং পাশাপাশি অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। 'অসহযোগ আন্দোলন' ছাড়াও মূল ভাষণটিকে যে তিন ভাগে ভাগ করা হয় তা হলো-

ক. অতীত ইতিহাস (সংক্ষেপে)
খ. নির্বাচনের ম্যান্ডেট অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তর করা
গ. নতুবা 'অসহযোগ আন্দোলন'-এর পাশাপাশি স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

৫ মার্চের গভীর রাতে 'বিএলএফ' হাইকমান্ড বঙ্গবন্ধুকে যে তিন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে বক্তৃতা দেয়ার পরামর্শ দেন তা হলো-

- প্রথম-সংক্ষেপে অতীত ইতিহাসের বর্ণনা
- দ্বিতীয়-অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহতভাবে পরিচালনা করা
- তৃতীয়-স্বাধীনতা আহ্বান উল্লেখ করে বক্তৃতা শেষ করা।

বঙ্গবন্ধু ৬ মার্চের সকাল থেকেই 'বিএলএফ' ও আওয়ামী লীগের 'হাইকমান্ড'-এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বারবার বৈঠক করেন। বৈঠকের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড 'মুক্তির সংগ্রাম' শব্দটি দিয়ে বক্তৃতা শেষ করার কথা বলেছে। তখন 'বিএলএফ' হাইকমান্ড নেতৃবৃন্দ স্পষ্টভাবেই বলেন, 'মুক্তির সংগ্রাম' ও 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' বক্তৃতার এক লাইনে থাকতে হবে এবং সে লাইন দিয়েই বক্তৃতা শেষ করতে হবে। তখন বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ 'হাইকমান্ড'-এর কাছে বিষয়টি তুলে ধরেন। ৬ তারিখ বিকাল নাগাদ **'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'** এভাবে বক্তৃতার লাইনটি ঘোষণা দেয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ 'হাইকমান্ড' একমত হয়েছে বলে বঙ্গবন্ধু 'বিএলএফ' নেতৃবৃন্দকে জানালেন।

উল্লেখ্য, ৪, ৫ এবং ৬ মার্চ প্রতি ২/৩ ঘন্টা অন্তর অন্তর আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড ও 'বিএলএফ' হাইকমান্ডের সঙ্গে পৃথক-পৃথকভাবে সভা অনুষ্ঠিত হতো। প্রতিটি সভার প্রসঙ্গ থাকতো ৭ মার্চের বক্তৃতায় বিষয়াদি। তবে ৬ মার্চ সন্ধ্যায় 'বিএলএফ' বঙ্গবন্ধুকে বলেন, উক্ত লাইনটি ঘুরিয়ে বলতে হবে-অর্থাৎ **'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।**

এর কিছুক্ষণ পরে 'বিএলএফ' হাইকমান্ডকে বঙ্গবন্ধু জানালেন যে, আওয়ামী লীগ 'হাইকমান্ড' 'বিএলএফ' হাইকমান্ডের এ প্রস্তাবে একমত আছে। তখন 'বিএলএফ' হাইকমান্ড ৭ মার্চের বক্তৃতার জন্য বঙ্গবন্ধুকে পয়েন্টগুলো লিখে দেন। প্রায় দু'ঘন্টা পরে বঙ্গবন্ধু প্রথবারের মতো 'বিএলএফ' হাইকমান্ডকে শোনালেন তিনি কীভাবে জনসভায় বক্তৃতা করবেন। ৬ মার্চ রাত ১২ টায় বিএলএফ 'হাইকমান্ড'-এর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পুনরায় আলোচনা হয়। বঙ্গবন্ধু আবারো বক্তৃতাটি আওড়ালেন, **'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'** বলে শেষ করেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কেমন হলো?

আলোচনার এ পর্বে 'বিএলএফ' হাইকমান্ড খুব সুক্ষ্ম একটি বিষয় বঙ্গবন্ধুর কাছে তুলে ধরলেন। তা হলো-**'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'** বলার পর জনসভা থেকে যে মর্হুমুহু করতালি ও গর্জন উঠবে সে শব্দে ওই লাইনের শেষ অংশ **'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'** ভালোভাবে শোনা যাবে না। সে কারণে জনতার গর্জন শেষ হওয়ার পর পুনরায় বঙ্গবন্ধু যেন **'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম', এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'** উল্লেখ করেন এবং জয়বাংলা বলে বক্তৃতা শেষ করেন।

বিষয়টি তুচ্ছ বলে মনে হলেও সে সময়ের জন্য এ লাইনটি ছিলো ঐশী বাণীর মতো। এখনও ওই অসম্পাদিত (ভাষণ) বক্তৃতায় **'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'** দু'বার শোনা যায় এবং ঠিকই প্রথমবার জনতার জয়ধ্বনির কারণে ওই লাইনের শেষাংশটি আড়ালে পড়ে গিয়েছিলো। পুনরাবৃত্তি করার কারণে বক্তৃতাটি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আজও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের বক্তৃতা যখন মাঠে-ময়দানে বাজানো হয়, তখন দ্বিতীয়বারের কথাটি শোনা যায়। প্রথমবারের কথাটি সম্পাদনা করে দেয়া হয়েছে। রেডিও বাংলাদেশ-এর আর্কাইভে তার অসম্পাদিত বক্তৃতাটি এখনো সংরক্ষিত আছে।

মধ্যরাতের এ আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে বললেন, প্রথমবার ওই ঘটনা ঘটলে তাকে যেন কোনো না কোনোভাবে মঞ্চ থেকেই মনে করে দেয়া হয়। তার সে কথার প্রসঙ্গে ধরে আ স ম আবদুর রবকে বঙ্গবন্ধুর জামা-পাজামায় একটু টান দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

আর এ হলো, স্বাধীনতা সংগ্রামের 'বীজমন্ত্র' বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মূল ইতিহাস!

পরিশেষে যে কথাটি বলতে হয়, যখন কেউ ভাবেনি স্বাধীন বাংলার কথা, আলাদা একটি পতাকার কথা, স্বাধীন বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্রের কথা, যারা ভেবেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং হাতে হাত রেখে দীপ্ত ও নির্ভীক শপথ নিয়েছিলেন, বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়ার, তাঁরা আর কেউ নন ১৯৬২'র ছাত্রলীগের সে **'তিনজন'** ছাত্রনেতা, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদ আর তাঁদের গড়া গোপন সংগঠন 'নিউক্লিয়াস' বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'! আদতে, তাঁরা তিনজন পৃথক পৃথক ব্যক্তি হলেও বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ছিলেন একে অন্যের পরিপুরুক। আরো স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন,এ তিনজনই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল পরিকল্পনাকারী!

অভিলাষ খান
উন্নয়ন গবেষক ও মানবাধিকার কর্মী

খন্দকার আতাউল হক
সম্পাদক, পাক্ষিক আলোর মিছিল

প্রবন্ধঃ সিরাজুল আলম খান নির্বাচিত রাজনৈতিক রচনাবলী থেকে সংকলিত।